বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর

মানুষ আপনার মনের ভাব কিরূপে বাহিরে প্রকাশ করে এবং যাহাতে সেইটি বহু দিন থাকে, তাহার চেষ্টা করে, তাহার ইতিহাস অতি অপূর্ব্ব। প্রথম প্রথম মানুষ কোন প্রধান ঘটনা দেখিলে তাহার ছবি আঁকিয়া রাখিত। পাথরে আঁকিয়া রাখিলে অনেক দিন থাকিবে, সেই জন্য পাথরেই আঁকিত। মিসর দেশে এইরূপ ছবি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ ছবি আঁকাকে "হায়রোগ্লিফিক্" বলে।

ইহার পর আর এক রকমের ছবি হয়। সে ছবি কতকটা লেখার মত। একটা মাছ লিখিলে মাছ জাতিকে বুঝাইবে। তাহার পর বিশেষ বিশেষ মাছ লিখিতে হইলে বিশেষ বিশেষ দাগ লাগাইতে হইবে। এইরূপে পৃথিবীর সব জিনিষের একটা একটা ছবি আঁকিয়া লওয়ার নাম "পিক্‌চার রাইটিং" অথবা "ছবি-লেখা"। চীনদেশে এইরূপ লেখা চলতি আছে।

তাহার পর মেসোপটেমিয়ায় আর একরূপে লোকে মনের ভাব ও পৃথিবীর ঘটনা প্রকাশ করিত। তাহাদের একটা করিয়া তীরের আগার মত দাগ থাকিত। সেই তীরের আগা দুটা, তিনটা, চারটা করিয়া আঁকিয়া মনের ভাব বা পৃথিবীর ঘটনা প্রকাশ করিত। ইহার নাম "কিউনিফরম্" লেখা।

কিন্তু এখনও অক্ষর হয় নাই। একটি একটি শব্দ একটি একটি দাগ দিয়া প্রকাশ করার নাম অক্ষর। ইউরোপীয়গণ বলেন, ফিনিসিয়া দেশের লোকেরা সর্ব্বপ্রথম অক্ষরের সৃষ্টি করে। তাহাদের অক্ষর বাইশটি মাত্র। তাহাদের অক্ষরগুলির আকার বাহিরের বস্তুর সহিত মিলে—যেমন "আ্যালফা" বলিতে ষাঁড় বুঝায়। "আ্যালফা" অক্ষরটিতে একটা দাঁড়ির উপর দুই দিক্ হইতে দুইটা ট্যারচা দাঁড়ি আসিয়া পড়িয়াছে। দেখিতে ঠিক ষাঁড়ের শিঙের মত হইয়াছে। "বেথ" অক্ষরটি ডালাখোলা একটি বাক্সের মত। বেথ শব্দের অর্থও বাক্স। এইরূপ বাইশটি অক্ষরই বাহিরের বাইশটি পদার্থের প্রথম অক্ষর লইয়া। বাস্তবিকই এরূপ করিলে শিখাইবারও সুবিধা হয়। আমরাও এককালে কয়ে করাত, খয়ে খরগোস্, গয়ে গাধা, এইরূপ

করিয়াই অক্ষর শিখিতাম। কিন্তু আমাদের ক-খয়ের সহিত করাত বা খরগোসের কোন সম্পর্কই ছিল না। ফিনিস্ক্রিয়ানদের ঐরূপ আদি অক্ষর লইয়া বর্ণমালা। কিন্তু যে পদার্থের আদি অক্ষর, তাহার সহিত অক্ষরের আকার মেলে।

পারসী, আরবী, গ্রীক্, রোমান্, ইংলিশ, রুষিয়ান্ প্রভৃতি সকল বর্ণমালাই ফিনিসিয়া হইতে উৎপন্ন। আমাদেরও তাই। কিন্তু কিরূপে উৎপন্ন হইল? ২২টা হইতে ২৪টা, কি ২৬টা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, ৩০টা অবধি হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ হওয়া বিলক্ষণ কঠিন। আর এক কথা—আরব, পারস্ত, গ্রীক্ ও লাটিন দেশ ফিনিসিয়ার কাছে; সুতরাং ফিনিসিয়া হইতে কিছু ধার করা বড় কঠিন নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ অনেক দূরে; কেমন করিয়া ধার লইল? এ সকল কথার মীমাংসা আমি এ প্রস্তাবে করিবার প্রয়োজন দেখি না। এ সম্বন্ধে বিউলার সাহেবের মত খুব চলিতেছে। সুতরাং দু চার কথায় তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম।

বিউলার সাহেব বলেন,—ফিনিসিয়ানদের প্রথমকার লেখা পাওয়া যায় না। মোয়াব্‌দের দেশে একখানা পাথরে একখানা শিলাপত্র আছে। সেই পত্রই ফিনিসীয় অক্ষরের সকলের চেয়ে পুরাণ। ব্যাবিলন দেশের বাট্‌খারার উপর কতকগুলি অক্ষর থাকিত। সেগুলি মোয়াব্‌দের অক্ষরের চেয়ে কিছু নূতন। বিউলার বলেন, বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সেই অক্ষর-গুলি আরবদেশের দক্ষিণাংশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্রমে সেখান থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণে আসে। তখন লেখাটা ডান দিক্ থেকে বাঁ দিকে আসিত। ভারতবর্ষে আসিয়া উহার দিক্ বদলাইয়া যায়। তখন বাঁ দিক্ হইতে ডান দিক্ যাইবার ব্যবস্থা হয়। বাইশটি হইতে পঞ্চাশটি অক্ষর করিতে গেলে কোনটিকে কাৎ করিতে হয়, কোনটিকে উল্‌টাইয়া ফেলিতে হয়, কোনটিতে বিন্দু দিতে হয়, কোন জায়গায় বা অন্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। **১ম চিত্রে** মোয়াবাইট, ফিনিসিয়ান ও আমাদের ব্রাহ্মী, এই তিনটি অক্ষরের ছবি দেওয়া হইল। ফিনিসীয় ও মোয়াবের অ-র একটা কোণ মাঝখানে কাটা। ব্রাহ্মীর 'অ' কোণের মাথার উপর দিয়া একটা খাড়া দাঁড়ি টানা। ফিনিসীয় ও মোয়াবের 'ব' একটা দাঁড়ির উপর অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া; ব্রাহ্মীর 'ব' ঠিক উল্‌টাইয়া অর্দ্ধচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্রের উপর একটা লম্বা দাঁড়ি দেওয়া। ১ম বাইশটি মাত্র অক্ষরের ছবি আছে। অপরগুলির ছবি দেওয়া হয় নাই। সেইগুলি দেখিলে উপরে যাহা লেখা আছে, তাহা ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইবে।

আমরা যাহাকে ব্রাহ্মী বলিলাম, তাহার অনেক নাম আছে;—কেহ কেহ ইহাকে অশোক অক্ষর বলেন, কেহ কেহ ইণ্ডো-পালি বলেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন পুস্তকে ইহার নাম ব্রাহ্মী—আমাদের দেশের সকল অক্ষরের এই আদি। অশোক রাজার সময়ে প্রায় ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা খুব চলতি ছিল, সেই জন্ত কেহ কেহ ইহাকে অশোক অক্ষর বলেন। ইহা হইতেই আমাদের দেশের সকল অক্ষরের উৎপত্তি।

আমরা **২ চিত্রে** ব্রাহ্মী হইতে কেমন করিয়া বাঙ্গালা অক্ষর হইয়াছে, তাহাই দেখাইব। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ওঝা মহাশয় তাঁহার প্রাচীন লিপিমালার দ্বিতীয় সংস্করণে

যে সকল চিত্র দিয়াছেন, তাহারই একখানি হইতে আমরা এই চিত্রটি সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাতে পাঁচটি কলম আছে। প্রথম লতায় বাঙ্গালা অক্ষরগুলি দেওয়া আছে। এ অক্ষর এখন চলিতেছে। দ্বিতীয় লতায় অশোকের সময়ের অক্ষর আছে, তৃতীয়ে অশোকের ৪০০ শত বৎসর পরে কুষণ রাজাদের সময় যে অক্ষর ছিল, তাহাই আছে, চতুর্থে কুষণদের ৩০০।৪০০শত বৎসর পরে গুপ্তরাজাদের অক্ষর দেওয়া আছে। পঞ্চমে গুপ্ত রাজাদের ৩০০ শত বৎসর পরের অক্ষর দেওয়া আছে, তাহার পরে পুরাণ বাঙ্গালা দেওয়া আছে। ৩০০।৪০০ শত বৎসর অন্তর কেমন করিয়া অক্ষরগুলি আস্তে আস্তে বদলাইতেছে, এ চিত্রে তাহা বেশ অনুভব করা যায়। নীচ ও উপর হইতে দুইটি রেখা আসিয়া এক বিন্দুতে মিলিল; সেই বিন্দু হইতে খাড়া উপর নীচে দাঁড়ি টানিলে অশোকের 'অ' হইল। কুষাণের 'অ' নীচেকার রেখাটী একটু বাঁকা, উপরের রেখাটি একটু বড়, আর সব অশোকের 'অ'রই মত। গুপ্ত 'অ'-কারে নীচেকার রেখাটি একেবারে বাঁকা এবং সে রেখার সহিত উপরের রেখা মিলে নাই। গুপ্ত অক্ষরের ৩০০ বৎসর পরে উপরের রেখার সহিত খাড়া দাঁড়ির মিলনটা খুব বড় হইয়া গিয়াছে; যেন চৌকা হইয়া গিয়াছে। নীচের রেখাটি তাহার বাঁ দিকের কোণে বাঁকা হইয়া লাগিয়া আছে। তাহার পর আমাদের পুরাণ অ কার, তাহার পর আমাদের এখনকার অ-কার।

হ্রস্ব 'ই' অশোক অক্ষরে তিনটি বিন্দু,—উপরে একটি, নীচে দুইটি। কুষাণদের সময় প্রথম বিন্দুটি একটি রেখা হইয়া গিয়াছে; তাহার নীচে দুইটি বিন্দু। গুপ্ত অক্ষরেও ঠিক তাই, কেবল দাঁড়িটির বাঁ দিক্ হইতে একটি রেখা বাঁকিয়া আসিয়া ডান দিকের বিন্দুতে মিশিয়াছে, আর বাঁ দিকের বিন্দু হইতে একটি রেখা টারচা হইয়া নীচের দিকে নামিয়াছে। ইহার পর আবার দুইটি বিন্দুর মধ্যেও একটি রেখা হইয়াছে। তাহার পর এক টানে কলম না তুলিয়া সমস্ত অক্ষরটি লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাহার পর আমাদের এখনকার 'ই'—রেখাটির মাথায় একটি চৈতন বাহির হইয়াছে।

হ্রস্ব 'উ' অশোক অক্ষরে উপর হইতে নীচে একটি দাঁড়ির তলা হইতে সমকোণ করিয়া একটি ছোট রেখা। কুষাণ অক্ষরে এই রেখাটি একটু বড়, গুপ্ত অক্ষরে ঐ রেখাটির আবার একটি হুল নীচের দিকে বাহির হইয়াছে। তাহার পরের অক্ষরে সমকোণটি নাই। আর এখনকার বাঙ্গালায় দাঁড়িটির মাথায় একটি মাত্রা আছে, আর একটি চৈতন আছে।

একার। অশোকের 'এ' একটি ত্রিভুজ। কোণটির উপরে ডাহিন হইতে বাঁয়ে একটি রেখার উপরে আঁকা। কুষাণের 'এ' ঠিক ইহার উল্টা। গুপ্তদের 'এ' উপরে মাত্রা, তাহার ডান আগা হইতে সমকোণ করিয়া একটি দাঁড়ি নামিয়াছে। তাহার শেষ বিন্দু হইতে মাত্রার বাঁ দিকের বিন্দু পর্য্যন্ত একটি অল্প বাঁকা রেখা। গুপ্তদের পরে মাত্রার সহিত এই রেখার সম্বন্ধ একটু বিচ্ছেদ হইয়াছে। আমাদের একারে সে সম্বন্ধ একেবারেই নাই।

'ও'। উপর হইতে নীচে একটি দাঁড়ি টানিয়া, তাহার সহিত সমকোণ করিয়া, উপরের বিন্দু হইতে বাঁ দিকে এবং নীচের বিন্দু হইতে ডান দিকে দুইটি ছোট ছোট রেখা টানিলে

'ও' হয়। কুষাণেও তাই। গুপ্ত অক্ষরে নীচে সমকোণ নাই এবং রেখাটিও সরল রেখা নয়। গুপ্তের পর নাচের সরল রেখাটি বেশ বাঁকিয়া গিয়াছে। আমাদের ওকারের উপর নীচ দুইই বাঁকিয়াছে।

'ক'। ডান হইতে বাঁয়ে একটি রেখার উপর তাহাকে সমকোণে ছেদ করিয়া উপর হইতে নীচে একটা দাঁড়ি টানিলে 'ক' হয়। কয়ের মধ্যবিন্দু হইতে চারি দিকে চারিটি রেখাই এক সমান। কুষাণদের সময় বাঁ হইতে ডান রেখাটি বাঁকিয়া গিয়াছে। গুপ্ত অক্ষরেও রেখাটি বাঁকা ত আছেই, খাড়া রেখাটিরও তলাটা বাঁকিয়া গিয়াছে। গুপ্তের পরে বাঁ দিকের বাঁকা দুটি রেখা জুড়িয়া গিয়াছে। তাহার পর আমাদের 'ক', সেই জোড়াটি একটি ত্রিভুজ হইয়াছে, আর ডান দিকের রেখাটি একটি আঁকড়ি হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে ৫০টি বর্ণই কেমন করিয়া অশোক হইতে আমাদের বাঙ্গালা হইল, তাহা এই চিত্রে দেখান আছে।

বাঙ্গালা অক্ষরে যে সকল পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বঙ্গভূমীশ্বর রাজা হরিবর্ম্মদেবের ৩৯ সালের লেখা একখানি বৌদ্ধপুথি সকলের চেয়ে পুরাণ। এই পুথি-খানি যশোহর জেলার ব্যাং নদীর ধারে লেখা হইবার ৭ বৎসরের মধ্যে ৭ বার পাঠ করা হয়। রাজা হরিবর্ম্মদেবের সময় এখনও সূক্ষ্ম করিয়া বলা যায় না। তবে এ কথা ঠিক যে, তিনি ১০ ও ১১ শতকের সন্ধিস্থলে বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুথিখানি কালচক্রযান নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মূল পুথির টীকা। এই পুথিখানির অক্ষরের টান প্রায়ই এখনকার অক্ষরের মত। তালব্য 'শ'-টি বেশ দুপুঁটুলি। বর্গীয় 'জ' ঠিক আমাদের মত, 'ক' যদিও একেবারে তেকোণা নয়, কিন্তু প্রায়ই আমাদের মত; কেবল ডান দিকের কোণটি একটু বাঁকা। 'খ' প্রায়ই আমাদের মত, কেবল নীচের দিকে দুটা কোণ হয় নাই, একটা বাঁকা রেখা চলিয়া গিয়াছে। গ, ঘ, ঙ তিনই এখনকার মত। আমাদের ছাপার 'চ' উপর-নীচের একটা দাঁড়ির ডান দিকে একটা থলে, কিন্তু আমাদের হাতের লেখা 'চ' কখনই এরূপ ছিল না। দাঁড়িটা একটা বাঁকা রেখা, বাঁদিকে হেলা, থলেটাও সেই রকম। এ পুথির 'চ' ঠিক সেই রকম। দুটা 'চ' জুড়িয়া 'ছ' হয়, তবে এখনকার বাঙ্গালায় 'ছ'য়ের কোলের দিকে একটু টান থাকে; এখনও পাঠশালায় বলে "কোলটানা ছ"। বর্গীয় 'জ' ঠিক এখনকার মত। কেবল ডান দিকের রেখাটা মাত্রার নীচে থেকে না বেরিয়ে আরও খানিক নীচে থেকে বেরিয়েছে। কাঁধে বাড়ী 'ঝ' তখনও যেমন, এখনও তেমনি। বিশেষের মধ্যে এই, পালানের নীচের মুখটা জোড়া নয়। ট-য়ের চৈতন পর্য্যন্ত আছে, ঠিক এখনকার মত। তখনকার ঠ-য়ের মাত্রাও নাই, চৈতনও নাই। ড, ঢ, ণ ঠিক এখনকার মত। ৫ চিত্রে শেষ ছত্রে ব্যঞ্জন বর্ণগুলি সব দেওয়া আছে। কিন্তু জানি না, কোন্ কারণে আগে প-বর্গ, তাহার পর ত-বর্গ দেওয়া আছে। অক্ষরগুলি প্রায় এখনকার মত, কেবল 'প'টির নীচের মুখটা দাঁড়ির তলায় আসিয়া লাগিয়াছে। তাহার পর দন্ত্য 'স', তাহার পর আর একটি কি অক্ষর, তাহার পর 'ষ', পরে 'শ'

ও তাহার পর 'ক্ষ'। ৪ চিত্রে স্বরবর্ণগুলি দেওয়া আছে। 'অ', 'আ' প্রায়ই এখনকার মত, কেবল নীচের দিকে বাঁহাতি একটা ট্যারচা টান আছে। 'ই', 'ঈ' একটু পুরাণ, দুটা গোল শূন্য, তাহার মাথায় একটা রেখা; একটু চৈতনও আছে। দীর্ঘ 'ঈ' ঠিক হ্রস্ব 'ই'র মত, কেবল নীচের দিকে দেবনাগরী উকারের মত কি একটা লাগান আছে। তাহার পর ঋ ৠ ঠিক এখনকার মত, তাহার পর 'উ' 'ঊ'—দুইয়ের একটিরও চৈতন নাই; নীচের একটা টান দেখিয়া দীর্ঘ 'ঊ' চিনিয়া লইতে হয়। 'ঌ' 'ৡ' এখনকার মত নহে। 'এ' 'ঐ' ঠিক এখনকার মত। এ চিত্রে 'ও' 'ঔ' পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থকার নিজেই বর্ণমালাটি দিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য আমাদিগকে কষ্ট করিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া, বাছিয়া বাছিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে হয় নাই।

এ পুথিখানি যশোহরে ১১শতকের গোড়ায় লেখা; সুতরাং ইহার স্থান ও কাল একরূপ ঠিক আছে। তাই এখানির সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিলাম। অন্য পুথিতে এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না। ৩ চিত্রে যতটুকু লেখা আছে, আমরা তাহা তুলিয়া দিতেছি। পাঠকগণ অক্ষর মিলাইয়া পড়িবেন।

প্রথম লাইন—"প্রভায়াং নানোপায়বৈনেয়মহোদ্দেশঃ চতুর্থঃ সমাপ্তঃ॥ ॥ সমাপ্তেয়ং টীকা জ্ঞানপটলস্ত ॥ ০ ॥ সম্বুদ্ধব্যাকৃতেন প্রবরমণিগণং স্থাপিতং বুদ্ধমার্গে দত্ত্বা প্রজ্ঞাভিষেকং

দ্বিতীয় লাইন—"ইহ যশসঃ শ্রীকলাপে নৃপস্ত ॥ সম্বুদ্ধব্যাকৃতেন ॥ ॥ প্রমুদিতমনসা শ্রীযশশ্চো ॥ ॥ দিতেন টীকাং শ্রীমূলত[ন্ত্রে] স্ফুটকুলিশপদান্বেষিকাং তন্ত্ররাজে……

তৃতীয় লাইন—" ॥ ০ ॥ যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতোহ্যবদৎ তেষাং ॥ ০ ॥ চ যো নিরোধঃ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ ॥ দেয়ধর্ম্মোহয়ং……

চতুর্থ লাইন—"…ণ্যমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানফলাবাপ্তয়ে ইতি মহারা ॥ ০ ॥ জাধিরাজশ্রীমৎহরিবর্ম্মদেবপাদীয় সম্বৎ ৩৯………

পঞ্চম লাইন—" তে। মৃতয়া চুঞ্চুদুকয়া গৌর্য্যা স্বপ্নেন দৃষ্টয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিমাদায় পৃ-॥ -॥ ষ্ট-য়েদমুদীরিতং। পূর্ব্বোত্তরে দিশো ॥ ০ ॥ ভাগে বেংগনস্তান্তথাকুলে পঞ্চত্বং ভাষিতবতঃ সপ্তসম্বৎসরৈরিতি ॥"

এ পুথিখানি এসিয়াটিক সোসাইটীর। সেখানকার গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীতে আছে। প্রায় এইরূপ অক্ষরে এসিয়াটিক সোসাইটীতে আরও একখানি পুথি আছে। সেখানিও বৌদ্ধপুথি; নাম "ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি"। ৬ চিত্রে তাহার প্রথম পাতাখানির নকল দেওয়া গেল। এই পুথিখানির ডান দিকে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার 'ক' পূর্ব্বাপেক্ষা আরও তেকোণা হইয়াছে, কিন্তু এখনও বাঁ দিকে ঠিক দুইটি রেখার একটি কোণ

হয় নাই। তালব্য 'শ'টি ঠিক ছুপ্‌টুলি। কেবল 'হ'টি ভয়ের মত। প্রথম লাইনটি লিখিয়া দিতেছি, দেখিয়া লইবেন,—

"ওঁ নমঃ শ্রীলোকনাথায় ॥ সংক্ষিপ্তব্যতিরেকানাং ব্যাপ্তিরন্বয়রূপিণী। সাধর্ম্মবতি দৃষ্টান্তে সত্বে হেতোরিহোচ্যতে॥ যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা ঘটঃ সন্তশ্চামী ভাবা…"

ইহার মধ্যে "নমঃ শ্রীলোকনাথায়" ঠিক এখনকার মত। 'প'টি কেবল ঠিক টাঙ্গির মত নয়। টাঙ্গির মুখের নীচের রেখাটি যেন বাঁটের গোড়ায় গিয়া লাগিয়াছে। 'প'য়ে ও অন্তঃস্থ 'ব'য়ে ভেদ করা কঠিন। অন্তঃস্থ 'য'য়ের পেটটি একটু ঝোলা, একটু মোটা, 'প'য়ের সেটি নাই। খয়ের কাঁধে বাড়ীটি নাই; 'ধ'য়ের মাত্রাও নাই। 'ত'য়ের লেজটি এখনকার মত মাথায় উঠে নাই, যেন মাঝখানে কাটা পড়িয়াছে। আমরা মনে করি যে, এ পুথিখানিও যশোর অঞ্চলে হরিবর্ম্মদেবের সময় অথবা তাহার কাছাকাছি কোন সময়ে লেখা হইয়াছে।

৭ চিত্রে যে পুথিখানির শেষ পাতার ফটোগ্রাফ্ দেওয়া হইল, সেখানি অভয়াকরগুপ্তের লেখা। অভয়াকরগুপ্তের উপাধি ছিল মহাপণ্ডিত। পুথিখানি বৌদ্ধপুথি। বৌদ্ধেরাও তান্ত্রিকদের মত নানা রকম 'মণ্ডল' আঁকিত। সেই মণ্ডল আঁকাকে সাহায্য করিবার জন্ত ইহার উৎপত্তি। ইহার নাম "বজ্রাবলী-নাম-মণ্ডলোপায়িকা"। অভায়করগুপ্ত রামপালের রাজত্বে বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহাকে আমরা ১১ শতকের শেষে ও ১২ শতকের গোড়ায় বসাইয়া দিয়াছি। এই পুথির অক্ষরেও তেকোণা ভাবটা বেশী। 'ম' আর "হ' প্রায় আমাদের মত হইয়া আসিয়াছে। তবে 'হ' এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই। একটু যেন দেবনাগরীর দিকে টান আছে। 'ত'য়ের লেজ যেরূপ জায়গায় কাটা ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা একটু বাড়িয়া গিয়াছে। 'অ' এখন ঠিক বাঙ্গালা হইয়াছে, তবে অ-র বাঁ দিকে যেটুকু 'ও'য়ের মত, তাহার লেজ এখনও মাথায় উঠে নাই। হ্রস্ব 'ই'র চৈতনটি একটু একটু দেখা যায়। ৭ চিত্রের শেষ লাইনটি তুলিয়া দিলাম।

" গুলে বিশ্বমূর্ত্তেঃ ॥ ২৫০ ॥ মহাপণ্ডিতাভয়াকরগুপ্তরচিতা বজ্রাবলী নাম মণ্ডলোপায়িকা সমাপ্তা ॥"

পুথিখানির অক্ষর দেখিয়া বোধ হয়, যেন অভয়াকর গুপ্তের সময়েই লেখা হইয়াছিল।

৮ চিত্রখানি অভয়াকরগুপ্তের লেখা আর একখানি পুথির শেষ পাতা। নকল করিয়াছেন ধনশ্রী মিত্র। নকলের তারিখ ১০৪৭ শকাব্দা অর্থাৎ ১১২৫ ইংরাজী। এই যে তারিখটি, ইহা পুথি লেখার তারিখ, রচনার তারিখ নয়। কারণ, ইহা ভণিতার পরে দেওয়া আছে। ভণিতার আগে তারিখ থাকিলে সেটা রচনার তারিখ হয়, আর পরে থাকিলে সেটা নকলের তারিখ হয়। নকলের তারিখ ও তাহার পরের অংশ তুলিয়া দিলাম।

"শকাব্দাঃ ১০৪৭ শকাব্দে রুদ্রং মিশ্রয়িত্বা ষষ্টিভাগেন শেষঃ প্রভবাদিজ্ঞাতব্যো বৃহস্পত্যৌ প্রক্ষেপায়। বৈষম সম্বৎসরে প্রভবাদিবর্ষাণি ৩৮ অলেখিয়ং শ্রীধনশ্রীমিত্রেনৈঃ (?)।"

৯ চিত্র চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় বা চর্য্যাগীতির কয়েকখানি পাতার ফটো। এ পুথির অক্ষরগুলিও ১২ শতকের গোড়ার। ইহার 'প' অনেকটা এখনকার পয়ের মত হইয়া আসিয়াছে অর্থাৎ এখনকার পয়ের টাঙ্গির মত যে মুখ আছে, তাহার নীচের রেখাটি পয়ের দাঁড়িটার তলা পর্য্যন্ত যায় না, মাঝামাঝি পর্য্যন্ত যায়। তাহাতেই বোধ হয়, এটা ৩ ও ৭ চিত্রের চেয়ে কিছু নূতন। এ চিত্রের অন্তঃস্থ 'ব' আগেকার চিত্রের পয়ের মত। 'ষ'য়ের আর সেরূপ পেট মোটা নাই, পেটটা পড়িয়া গিয়াছে। সব তেকোণা অক্ষরেরই কোণগুলা বেশ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। 'র' 'ব' ঠিক তেকোণা হইয়া উঠিয়াছে। 'ধ'য়ের মাথায় একটু একটু বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়।

বইখানিতে কতকগুলি বাঙ্গালা দেশের গান সংগ্রহ করা আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা দেওয়া আছে। প্রথম পাতার দ্বিতীয় ছত্রের মাঝখানে, যেখানে একটা চৌকা ফাঁক আছে, তাহার পরে একটা 'স্ফুটং' শব্দ আছে। তাহার পর হইতে পড়ুন,—

দ্বিতীয় লাইন—"কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল
　　চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥ ০॥
　　দিট করিঅ মহাসু—

তৃতীয় লাইন—　　　হ পরিমাণ
　　লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান॥ ধ্রু॥
　　সঅল স[মা]হিঅ কাহি করিঅই
　　সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিআই॥ ধ্রু॥
　　এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের"

১০ চিত্র কাশ্মীরের দামোদর গুপ্তের লেখা "কুট্টনীমতের" শেষ পাতার ফটো। এ পাতায় আবার শেষ তিনটি ছত্র নেওয়ারী অক্ষরে লেখা। তাহাতে তারিখ দেওয়া আছে। নেওয়ারী তারিখ—ইংরাজীতে সে তারিখের অর্থ ১১৭২। সুতরাং পুথিখানি ১১৭২এর কিছু আগে লেখা হইয়াছিল। এর অক্ষরগুলি খুব স্পষ্ট স্পষ্ট এবং বেশ ছাড়া ছাড়া, একেবারেই জড়ান নয়। দ্বিতীয় লাইনের মাঝখানে আছে,—"কৃতিরিয়ং ভট্টদামোদরগুপ্তস্য মহাকবেরিতি"।

১১ চিত্রে "হেবজ্রতন্ত্রটীকা" নামক একখানি পুথির আধখানি পাতের ফটোগ্রাফ দেওয়া আছে। এ পুথিখানি ইং ১১৯৮ সালে লেখা। ইহাতে সমস্ত স্বরবর্ণগুলি দেওয়া আছে। 'এ', 'ঐ', 'ও', 'ঔ' ঠিক এখনকার বাঙ্গালার মত। 'অ' নাই। 'আ' ঠিক এখনকার মত, 'ই' একটু বিচিত্র। 'ই'য়ের মাথার দাঁড়িটি বাঁকিয়া গিয়াছে এবং নীচে ফুটির বদলে একটি বড় শূন্য আছে। হ্রস্ব ইর কোলে একটা টানা দিয়া 'ঈ' করা হইয়াছে। হ্রস্ব 'উ' ঠিক বাঙ্গালা 'ভ'য়ের মত। দীর্ঘ 'ঊ' তাহার কোলে একটা টানা। 'ই' 'ঈ', 'উ' 'ঊ' কাহারও মাথায় চৈতন নাই। 'ঋ' এখনকার ঋয়েরই মত, এখনকার 'ঋ' হইতে উহাকে তফাৎ করা কঠিন। হ্রস্ব 'ঋ'য়ের উপর একটা শিকলা দিয়া দীর্ঘ 'ৠ' করা হইয়াছে। '৯'টি এখনকার '৯'

খাড়া করিয়া দিলে যেমন হয়, প্রায় তেমনই। দীর্ঘ 'ঈ'ও তাই। এই আধখানি পাতায় যাহা আছে, পড়িতে কোন বাঙ্গালীর একটুও কষ্ট হইবে না। হেবজ্রতন্ত্রের 'প' চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের মত।

১২ চিত্র "রামচরিত" কাব্যের শেষ পাতার ফটোগ্রাফ্। গ্রন্থকারের নাম সন্ধ্যাকর নন্দী, নকল করিয়াছেন শীলচন্দ্র। ইহার 'প'ও চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও হেবজ্রতন্ত্রটীকারই মত। হ্রস্ব 'ই' দুইটি পুঁটুলি ও তাহার পাশে একটা দাঁড়ি ও মাত্রা। শেষ অক্ষর কয়টি,—

"ইতি শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দিবিরচিতং রামচরিতং নাম কাব্যং সমাপ্তমিতি। যথাদৃষ্টমিতি শ্রীশীলচন্দ্রস্য।"

১৩ চিত্র রামচরিতের টীকার শেষ পত্র। দ্বিতীয় স্বর্গের ৩৫ শ্লোকের টীকা ইহাতে শেষ হইয়াছে। ইহার পর আর টীকা পাওয়া যায় নাই। অক্ষর প্রায়ই মূলের মত, তবে মূল হইতে অনেকটা স্পষ্ট। ইংরাজী ১২ শতকের লেখা বলিয়া মনে হয়। শেষ তিনটি ছত্র লিখিয়া দিতেছি,—

"ইতীত্যাদি ইত্যনন্তরোদিতবিমর্দ্দব্যতিকরেণ যত্র সুবেলে বিবুধাদীনাং অঙ্গনানাং ভুজঙ্গান্তে বানরাদয়ঃ কল্যয়া মদিরয়া উদ্দীপ্তত্বাৎ আপ্তো মারো মন্মথঃ তেন ধারিতং সুরতং যেষাং তে তাদৃশা অপি দুর্ম্মনায়িতাঃ। অন্যত্র—ইত্যনন্তরোদীরিততদ্বংশাবমানে সতি যস্মিন্ ভীমে তে সুভটা ভীমসহায়াঃ ॥"

১৪ চিত্র। দ্বাদশ শতকে স্থিরমতি পণ্ডিত তিব্বত হইতে পুথি সংগ্রহ করিতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখানি তিনি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এখানি অনেক দিন নেপালে নেওয়ার রাজাদের গুরুর বাড়ীতে ছিল। নেপালের রাজার পুথিখানার অধ্যক্ষ এখানি আমাকে উপহার দিয়াছেন। ইহার অক্ষরগুলি একটু বাঁকা ছাঁদের, একটু ট্যারচা ছাঁদের—অত্যন্ত পরিষ্কার। পুস্তক শেষ হইলে লেখা আছে,—

"সমাপ্তেয়ং দোহাকোষস্য পঞ্জিকা। গ্রন্থপ্রমাণমষ্টশতমস্য কৃতিরিয়ং অদ্বয়বজ্রপাদানামিতি। অস্তব্যস্তপদো ভাতি গ্রন্থোয়ং লেখদোষতঃ। তথাপি লিখ্যতেঽস্মাভিঃ গ্রন্থসংগ্রহকাঙ্ক্ষয়া। দানপতিশ্রীস্থিরমতিপণ্ডিতস্য পুস্তকমিদং। লেখিক শ্রীউদয়ভদ্রেন। শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং॥"

১৫ চিত্রে যত দূর সম্ভব, ইহার একটি বর্ণমালা দেওয়া হইয়াছে। তিব্বতদেশীয় পণ্ডিতেরা আসিয়া জগদ্দল বিহারে থাকিতেন। জগদ্দল বিহার বরেন্দ্র-ভূমিরই কোন স্থানে ছিল। সুতরাং ইহার টান একটু উত্তরবাঙ্গালার মত হইবে। ইহার হ্রস্ব 'ই'তে মাত্রাও আছে, মাত্রার নীচে দুটি পুঁটুলিও আছে। দীর্ঘ ঈকারে ইকারের উপর ডাইনে একটি দাঁড়ি আছে। 'ঋ' অনেকটা অকারের মত। 'ঘ' ঠিক চিরুণীর মত। ঘ-য়ের কাঁধে একটা বাড়ী হইয়াছে। 'ড' প্রায় এখনকার মত হইয়াছে, কেবল লেজটি একটু কাটা। 'ফ' দেখিতে 'হ'য়ের মত হইলেও 'প'য়ের মাথা খুব ফাঁক করিয়া, তাহাতে একটা আঁকুড়ি দিয়া হইয়াছে।

১৬ চিত্র—অপোহসিদ্ধি। এখানিও আমার পুথি। নেপালের পুথিশালার অধ্যক্ষ ৺বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারীর দান। ইহারও অক্ষরাদি দোহাকোষ-পঞ্জিকার মত, তবে টাঁররচা নয়। গ্রন্থকারের নাম মহাপণ্ডিত স্থবির রত্নকীর্ত্তি।

১৭ চিত্র—সুভাষিতসংগ্রহ। ইহাতে বৌদ্ধদের অনেক সুভাষিত অর্থাৎ ভাল কথা জড় করা আছে; কতক সংস্কৃতে এবং কতক বাঙ্গালায়। পুথিখানি বিদ্যাপতি দত্তের লেখা। তিনি নালন্দার পার্শ্বে বটগ্রামে বসিয়া পুথিখানি লিখিয়াছিলেন। অক্ষরগুলি সরু সরু, কিন্তু বেশ স্পষ্ট। 'প' একেবারে বাঙ্গালা। 'ভ'ও অনেকটা বাঙ্গালা। 'ব'টি একেবারে তেকোণা। 'ধ'টি মাত্রাহীন 'ব'কারের মত, কাঁধে বাড়ী নাই। 'জ'কার ঠিক এখনকার মত। 'হ'টি এখনকার উল্টা 'ও'কারের মত।

এত ক্ষণ আমরা যে সকল পুথির আলোচনা করিতেছিলাম, সবই মুসলমান রাজত্বের আগেকার। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষর যে এত পুরাণ, তাহা কাহারও ধারণাই ছিল না। ইং ১৮৬৭ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেতুবন্ধের একখানি পুরাণ বাঙ্গালা অক্ষরের পুথি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, সে পুথিখানি ৬৩৬ বছরের পুরাণ। তাঁহার তারিখ ঠিক হইয়াছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তিনিও মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে যাইতে পারেন নাই। ১৮৮৩ সালে বেণ্ডল সাহেব ১১৯৮ সালের বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হেবজ্রতন্ত্রের একখানি টীকার একটি পাতের আধখানির এক ফটোগ্রাফ বাহির করেন। পূর্ব্বে তাহার কথা বলা হইয়াছে। বাকিগুলি সব আমার বাহির করা। ইহার মধ্যে ১৩ শতকের একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে (১৮ চিত্র দেখ); তাহাতে শকাব্দার তারিখ দেওয়া আছে ১২১১। সেখানি লেখা পূর্ব্ববাঙ্গালায়। পুথিখানি বৌদ্ধ পঞ্চরক্ষার পুথি। তখন পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন রাজা মধুসেন। উহার শেষে লেখা আছে,—"পরমেশ্বরপরমসৌগত-পরম-রাজাধিরাজশ্রীমদ্গৌড়েশ্বরমধুসেনদেবকানাং প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে যত্রাঙ্কেনাপি শকনরপতেঃ শকাব্দাঃ ১২১১ ভাদ্র দী ২।" ইহার অক্ষর কতকটা পুরাণ ঢংএর। 'র'টি ঠিক তেকোণা, কিন্তু মাঝে ফাঁক নাই, একেবারে নিরেট। 'ধ' মাত্রাশূন্য, কাঁধে বাড়ী নাই। 'প'টি পুরাণ 'প'। 'জ'টিও বাঙ্গালা, 'ভ'টিও বাঙ্গালা, তবে দু'টির একটিরও লেজ মাথায় ঠেকান নাই।

১৯ চিত্র—জীমূতবাহন দায়ভাগ লিখিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, দায়ভাগ ধর্ম্মরত্ন নামে একটি বড় নিবন্ধের অংশ মাত্র। সেই নিবন্ধের 'কালনির্ণয়' অংশটা 'ধর্ম্মরত্ন' নাম দিয়া ছাপান হইয়াছে। ইহার একখানি পুথিতে একটি তারিখ দেওয়া আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেটি নকলের তারিখ ভাবিয়া পুথিখানি ১৪১৭ শকে নকল করা হইয়াছে বলিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়। সেটি ঘটকসিংহের ছেলের ঠিকুজীর তারিখ। সে কালের পণ্ডিতেরা পুথির গায়ে অনেক জিনিসই লিখিয়া রাখিতেন; ঠিকুজিও লিখিতেন; সুতরাং পুথিখানা ঠিকুজির অনেক আগের লেখা। পুথিখানি যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম দেওয়া আছে; নিজের জন্যই তিনি লিখিয়াছিলেন। ঘটকসিংহ তাঁহার নিকট পুথিখানি পাইয়াছিলেন।

সুতরাং পুথিখানি হাত-বদল হইবার পর ঠিকুজীটা লেখা হইয়াছিল। সেই জন্ত আমরা ইহাকে ইং ১৪ শতকের পুথি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ১৪ শতকের পুথি বড় পাওয়া যায় না।

২০ চিত্র—এখানি 'তত্ত্বচিন্তামণি'কার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের লেখা কুসুমাঞ্জলির টীকা—নাম কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ। পুথিখানির শেষে অতি অস্পষ্ট একটি তারিখ আছে। তারিখটি রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নজরে পড়ে নাই; ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও পুথিখানি ব্যবহার করেন, তাঁহারও নজরে তারিখটি পড়ে নাই। তারিখটি শকাব্দা ১৩৩২=ইং ১৪২০। সুতরাং ১৫ শতকের পুথি। কিন্তু পুথিখানির প্রথম ৯০ পাতা এক হাতের লেখা, বাকিটুকু আর এক হাতের লেখা। যেখানে দুই হাতের লেখা মিলিয়াছে, সেখানে প্রথমটার খানিকটা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা গেল—একখানি পুরাণ পুথি ছিল। তাহার অর্দ্ধেকটা হারাইয়া যায় এবং অপর অর্দ্ধেক আর এক-খানি পুথি হইতে লইয়া যুড়িয়া দেওয়া হয়। প্রথম অর্দ্ধেকটা পুরাণ লেখা। তাতে সর্ব্বত্রই '৬' সংখ্যার জায়গায় 'ও' আছে। এইরূপ '৬'এর জায়গায় 'ও' লেখা ১৩০০ হইতে ১৪০০র মধ্যের পুথিতেই পাওয়া যায়। ১৩০০র পূর্ব্বেও এরূপ দেখা যায় নাই, পরেও অতি বিরল। সুতরাং এই কুসুমাঞ্জলি-টীকার পুথির প্রথম অংশটা ১৪ শতকের লেখা আমরা বলিতে পারি। ১৯ ও ২০ এই দুই চিত্রের অক্ষরগুলি সব ঠিক বাঙ্গালা; সব তেকোণা হইয়া গিয়াছে, বাঁকা রেখা নাই। ২১ চিত্র—সাহিত্য-পরিষদের কৃষ্ণকীর্ত্তন। উহার যে পাতে '৬'এর জায়গায় 'ও' আছে, সেই পাতাটির ফটোগ্রাফ দেওয়া হইল। আমাদের বিশ্বাস, এখানিও ১৪ শতকের লেখা। ইহারও অক্ষরগুলি বেশ পরিষ্কার ও বড় বড়। সকলেই ইহার সহিত অন্য অন্য লেখার তুলনা করিতে পারেন। ২২ চিত্র। ২২এর পুথিখানি ১৪৯২ সম্বতে অর্থাৎ ইং ১৪৩৬ সালে বেণুগ্রামে নকল করা হয়। সুতরাং এখানি ইং ১৫শ শতকের লেখা। এখানি বৌদ্ধদের পুথি। একজন কায়স্থ জমিদার তাঁহার পুত্রের জন্য একজন ভিক্ষুকে দিয়া পুথিখানি নকল করাইয়াছেন এবং আর একজন ভিক্ষুকে দিয়া সংশোধন করাইয়া লইয়াছেন। ২৩ চিত্র—বাঙ্গালা ৯৮৫ সালে অর্থাৎ ইং ১৫৭৮ সালের হাতের লেখা। এখানি কাশীদাসের আদিপর্ব্বের পুথি। অক্ষরগুলি মোটা মোটা, আর বেশ পরিষ্কার। পুথিখানি পরিষদের। ২৪ চিত্র—অঙ্গদ রায়বারের পুথি। নকলের তারিখ বাঙ্গালা ১০৮০ সাল, ইং ১৬৭৩। এখানি এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথি। ২৫ চিত্র জৈমিনি ভারত। নকলের তারিখ বাঙ্গালা ১১৭৫, ইং ১৭৬৮। এই সকল পুথি নিপুণ হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইং ১১ শতক হইতে ১৮ শতক পর্য্যন্ত বাঙ্গালা অক্ষরের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বেশ দেখা যাইবে। ইহার ভিতর এমন একখানি পুথিও নাই, যাহা দেখিবামাত্র বাঙ্গালা পুথি বলিয়া মনে না হয়। বাঙ্গালা অক্ষরের একটা ছাঁদ আছে। সে ছাঁদ এই সব পুথিতেই আছে।

ইহার পর আমরা বাঙ্গালা দেশের কতকগুলি শিলাপত্রের ফটো দেখাইব এবং তাহার অক্ষরের সহিত পুথির অক্ষর তুলনা করিবার জন্ত পাঠক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি।

২৬ চিত্র—হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এ শিলাপত্রখানি তাহাতেই লাগান ছিল। যেটুকুর ফটো আছে, তাহার পাঠ,—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

গাঢোপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্র-

মুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।

মা লুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি

বাগ্দেবতোপহসিতোঽস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ॥

এ অক্ষরের ছাঁদই আর একরূপ, বাঙ্গালার মতই নয়। 'ভ'টি আমাদের 'ভ' ত নয়ই, দেবনাগরীর 'ভ'ও নয়। 'শ'টি একপুঁটুলি, অথবা উহার একটা তেকোণা নাক আছে। 'ক'র টানটা এখনও কুটিলের দিকেই। 'ঙ' একেবারে দেবনাগরী। 'চ'ও দেবনাগরী, দাঁড়ীটার বাম দিকে থলে। ইহার সঙ্গে ৩য় চিত্রের ফটো মিলাইলে দেখা যাইবে, দু'টিই যদিও এক সময়েরই লেখা, কিন্তু ইহাদের প্রভেদ কত—একটা খাঁটি নাগরী, আর একটি খাঁটি বাঙ্গালা।

২৭ চিত্র—বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন দেবপাড়া গ্রামে যে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহারই শিলাপত্র। ইহারও অক্ষরগুলি নাগরী নাগরী বলিয়া মনে হয়। তবে কতকগুলি অক্ষর একেবারে বাঙ্গলা আছে—যেমন 'এ'কার, দন্ত্য 'স', 'ভ', 'তৃ'। দ্বিতীয় শ্লোকটি এই,—

ওঁ নমঃ শিবায়।   লক্ষ্মীবল্লভ-শৈলজাদয়িতয়োরদ্বৈতলীলাগৃহং

প্রদ্যুম্নেশ্বরশব্দলাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্মহে।

যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরভ[য়া] স্থিত্বান্তরে কান্তয়োঃ

দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতা শিল্পেঽন্তরায়ঃ কৃতঃ॥

ঠিক এই সময়ের পুথির অক্ষর ৯ চিত্রে দেওয়া আছে। এই দুই রকম অক্ষর তুলনা করিয়া দেখুন।

২৮ চিত্র—বল্লালসেনের সীতাহাটী শিলাপত্র। প্রথম শ্লোকটি এই,—

সন্ধ্যাতাণ্ডবসন্নিধানবিলয়ন্নান্দীনিনাদোর্ম্মিভি-

নির্ম্ম্যাদ····· দিশতু বঃ শ্রেয়োঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ।

যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমৈ···

···র্যাট্যারম্ভরসৈর্জয়ত্যভিনয়দ্বৈধানুবোধভ্রমঃ॥

ইহার সহিত কুট্টনীমতের (চিত্র ১০) তুলনা করুন।

২৯ চিত্র—বল্লভদেবের শিলাপত্র ১১০৭ শকাব্দের অর্থাৎ ইং ১১৮৫র খোদাই। অক্ষরগুলি কতক বাঙ্গালা, কতক আর এক রকম। তাহার পর ৩০ চিত্র লক্ষ্মণসেনের

তর্পণদীঘির তাম্রপত্র। এ দুইটি প্রায় একই সময়ের। ইহাদের সহিত ১১শ, ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ চিত্রের তুলনা করুন। এই শিলাপত্র দু'খানির কতকটা পড়িয়া দিতেছি।

২৯শ চিত্র,— … … … … …দুর্মুনা

অক্ষয়স্বর্গলাভায় জনন্যা জনকাজ্ঞয়া॥

এতস্যা ভক্তশালায়া নির্বাহার্থং মহাভুজঃ।

বিশালকীর্ত্তিশালিন্যাঃ শ্রীমান্ বল্লভদেবকঃ॥

শাকে নগনভোরুদ্রৈঃ সম্যাতে চোত্তরায়নে।

শুভে শুভে ক্ষণে রাশৌ শস্তে ব্যস্ততমোগুণঃ॥

৩০ চিত্র—পং ২২। মণ্ডলে—শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজশ্রীবল্লালসেনদেবপাদানুধ্যাতপরমেশ্বরপরমবৈষ্ণবপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী।

৩১ চিত্র—লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের শিলাপত্র। ইহারও ছাঁদ নাগরী, ঠিক বাঙ্গালা নয়। এখানি হয় ত ১১ শতকে খোদাই হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন, বক্তিয়ার খিলিজীর সময়ে লক্ষ্মণসেন বাঁচিয়া ছিলেন না, তাঁহাদের মতে ইহা ১২ শতকেরও হইতে পারে। অনেক অক্ষর ঠিক বাঙ্গালা থাকিলেও, ইহার ছাঁদ নাগরী।

৩২ চিত্র—এখানির ছাঁদই বাঙ্গলার; শকাব্দ ১১৬৫ তে (ইং ১২৪৩) চট্টগ্রামে খোদাই করা। প্রথম শ্লোকটি এই,—

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১১৬৫

দেবি প্রাস্তরবেহি নন্দনবনান্মন্দঃ কদম্বানিলো

বাতি ব্যস্তকরঃ শশীতি কৃতকেনালাপ্য কৌতূহলী।

তৎকালস্থলদঙ্গভঙ্গিমচলামালিঙ্গ্য লক্ষ্মীং বলা-

দালোলাননবিম্বচুম্বনপরঃ প্রীণাতু দামোদরঃ॥

পুথি ও শিলাপত্রের লেখা আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক দেশের একই সময়ের, পুথির অক্ষর একরূপ, আর শিলাপত্রের অক্ষর আর একরূপ। এইরূপ ১১ ও ১২ শতক চলিয়াছে। পুথিগুলি বৌদ্ধদের, শিলাপত্রগুলি ব্রাহ্মণদের। বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে অক্ষর ও ছাঁদ কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। হিন্দুদের ঐ সময়ের পুথি পাওয়া যায় নাই। সুতরাং যত দূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণেরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা পশ্চিমের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। আর দেশের লোক (অর্থাৎ বৌদ্ধেরা) দেশের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। এই দু'য়ের লড়াইতে দেশের লোকে অর্থাৎ বৌদ্ধেরা জয়লাভ করিল। তেকোণা অক্ষর চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরাও শেষে সেই অক্ষরেই পুথি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান-বিজয়ের পর শিলাপত্র এই দেশের অক্ষরেই লেখা হইত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাঙ্গালার প্রাচীন রূপ

এখন বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করেন, প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গালা ভাষার জন্ম ;—তবে সে প্রাকৃতটা মাগধী, কি গৌড়ী, ইহা লইয়া মতভেদ আছে। আবার সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের জন্ম হইয়াছে, কি প্রাকৃত ভাষাটাই সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃত ভাষা নাম ধরিয়াছে, তাহা লইয়া আবার দুই মত আছে। আমাদের সে বিচারে তেমন কিছু প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু ধরিয়া লইলেই চলে যে, সংস্কৃত ভাষাটা কেবল সাহিত্যের ভাষা ছিল ; শিক্ষিত লোকের মধ্যে হয় ত কথোপকথনেও ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু জনসাধারণের কথোপকথনের ভাষা ছিল প্রাকৃত। এখন যেমন দেশভেদে ভারতে বিভিন্ন দেশভাষা প্রচলিত আছে, পূর্ব্বকালেও তেমনই বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া মৃত, অপরিবর্ত্তনীয় ও সাহিত্যের ভাষা হইয়া থাকিল। কিন্তু জীবন্ত প্রাকৃত ভাষা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পালিও একটা প্রাকৃত ভাষা ; বুদ্ধদেবের বাণীর প্রচার ইহাতেই হইয়াছিল বলিয়া একটা সাহিত্য ইহাতে গড়িয়া উঠিল। অপর দিকে ইহার পরে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃতে কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হইল, ইহাও কিছু দিন ধরিয়া উত্তর-ভারতের সাহিত্যের ভাষা ছিল। সাহিত্যের ভাষা হইবামাত্র পালি ও মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ব্যাকরণ রচিত হইল। কিন্তু যখন ব্যাকরণ রচিত হইল, তখন দেশের প্রাকৃত ভাষা অন্য রূপ ধরিয়াছে। প্রাকৃত ব্যাকরণগুলিতে মহারাষ্ট্রী ব্যতীত শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী ও আবন্তী, এই চারি প্রাকৃতের বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ, রচিত সাহিত্যে নাটকীয় অশিক্ষিত পাত্রের কথাবার্ত্তায় এগুলি ব্যবহৃত হইত। কিন্তু কোন বৈয়াকরণিক গৌড়ীয় প্রাকৃতের উদাহরণ পান নাই। ইহার অর্থ এমন নয় যে, কোন প্রাকৃত ভাষাই গৌড়ীয় আখ্যা পায় নাই। কথাটা এই, সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই, এমন বহুপ্রকার প্রাকৃত দেশে প্রচলিত ছিল, সে সকল ভাষার বাক্য কেহ সংগ্রহ করে নাই। আমাদের বাঙ্গালা ভাষাটাকেই প্রাচীন যুগে অনেক গ্রন্থকার পরাকৃত বা প্রাকৃত বলিয়াছেন। পালরাজাদের আমলে না হউক, সেনরাজাদের যুগে গৌড়ে যে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা গৌড়ীয় প্রাকৃত নাম হয় ত পাইয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে কোন সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। মগধের ডাক-নাম বড় ; পালরাজারা প্রথমে মগধেই রাজধানী করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বহু দিন ধরিয়া মগধ পূর্ব্বভারতের রাজাদের প্রধান স্থান ছিল। তাই মাগধী প্রাকৃতের নাম বেশী। গৌড়ী প্রাকৃতের কিছু পার্থক্য থাকিলেও তাহা পৃথক্ নাম পায় নাই। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কথ্যভাষার বিশেষত্ব সাহিত্যে যেমন স্থান পায় নাই, সে কালে গৌড়ীয় প্রাকৃতের বোধ হয়, সেইরূপ অবস্থা ছিল। সুতরাং আমার মনে হয়, মাগধীই বাঙ্গালা ভাষার সাক্ষাৎ জননী।

ভাষার বিশেষত্ব সূচিত হয়—সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের দ্বারা। সুতরাং এই প্রবন্ধে আমি প্রাচীন বাঙ্গালার ক্রিয়া ও সর্ব্বনামের মূল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের জন্ম হউক আর নাই হউক, একটা যখন শিক্ষিতের বা সাহিত্যের ভাষা, আর একটা যখন জনসাধারণের কথাবার্ত্তার ভাষা, তখন পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রভাব পড়িবেই। সংস্কৃত যেন সৌখীন ধনীর ভাষা, আর প্রাকৃত ছিল কাঙ্গাল গৃহস্থের ভাষা। সংস্কৃত আনন্দ বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ভাষা—সে একের জায়গায় দশ করিত, আর প্রাকৃত কাজ চালাইবার ভাষা, সে দশের জায়গায় এক করিত। সংস্কৃতে দশ লকার, দশ গণ, ৩ বচন; প্রাকৃতে ৪ লকার (বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞা), এক গণ ও দুই বচন। ইহার দুই কারণই সম্ভব, অল্পেই কাজ চলে বলিয়াই হউক কিংবা ক্রিয়ার বহু রূপ শিক্ষা করিতে যে আয়াস আবশ্যক, প্রাকৃত জন তাহা স্বীকার করিতে চাহে না বা পারে না বলিয়াই হউক, প্রাকৃত জনের ভাষা সাহিত্যের ভাষা অপেক্ষা সরল ছিল।

১। অতীতে ল *

বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয়ে কেবল উচ্চারণ সরল করিবার জন্য বা প্রকৃত উচ্চারণে অসামর্থ্য নিবন্ধন যৎসামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু ক্রিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বনামের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, বাঙ্গালার ক্রিয়া ও সর্ব্বনামের বর্ত্তমান রূপের মূল নির্ণয় করা বড়ই কঠিন কার্য্য। এই প্রবন্ধে প্রথমে দেখা যাউক, বাঙ্গালায় অতীত কালের চিহ্ন কিরূপে আসিল।

অতীতে 'ল' শুধু বাঙ্গলা ভাষা বলিয়া নহে, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী (মাগধী), ভোজপুরী এবং মারাঠী ভাষায়ও প্রচলিত আছে। নাই কেবল শৌরসেনী প্রাকৃতের দেশের ভাষা হিন্দীতে।

সংস্কৃতে অতীতের তিন লকার—লিঙ্, লুঙ্ ও লিট্। ইহার কোন লকারেই অতীতের ল চিহ্নের মূল নাই। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে ভূত কালে ধাতুর উত্তর ঈঅ এবং একস্বরবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর হীঅ হইত। আবার অকারান্ত ধাতুর উত্তর ক্ত-প্রত্যয় পরে ই হইত; যথা,—সং পঠ ধাতু + ক্ত হইতে প্রাকৃত পঢ়িঅ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতের এই ক্ত-প্রত্যয়ই অতীত কালের 'ঈঅ' বা 'হীঅ'তে পরিণত হইয়াছিল। যাঁহারা একেবারেই প্রাকৃত জানেন না, তাঁহাদের জন্য এইখানে একটি নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সংস্কৃত শব্দের অযুক্ত অনাদিস্থিত ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য ও ব, এই অল্পপ্রাণ বর্ণগুলি সাধারণতঃ প্রাকৃত ভাষায় লুপ্ত হইয়া যায় এবং খ, ঘ, থ, ধ, ফ ও ভ, এই মহাপ্রাণ বর্ণগুলি 'হ'য়ে পরিণত হইত।

এখন প্রাকৃতে অতীত কালে ঈঅ, হীঅ বা ইঅ, যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গালার অতীত কালে 'ল'-চিহ্নের মূল এখানেও পাইতেছি না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, দেশ ও

* কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে (হাওড়ায়) পঠিত।

কালভেদে কথ্য ভাষার ভেদ হয় এবং মৃত ভাষা ও তাহার ব্যাকরণে যত পরিবর্ত্তন ঘটে, জীবন্ত ভাষায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ও দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আবার জীবন্ত ভাষায় রচিত পুস্তক হইতে যখন তাহার ব্যাকরণ সঙ্কলিত হয়, তখন জীবন্ত ভাষায় আবার এমন পরিবর্ত্তন ঘটে, যাহার জন্ত ব্যাকরণকারকে আবার নূতন সূত্র গড়িতে হয়। অর্থাৎ জীবন্ত ভাষার ব্যাকরণ ভাষার পিছু পিছু ছুটিতে থাকে, কিন্তু কখনও নাগাল পায় না, ব্যাকরণকার হয় ত শেষে শ্রান্ত হইয়া ব্যাকরণের সূত্র গড়া বন্ধ করে, কিন্তু জীবন্ত ভাষা সমান তালে নূতন নূতন পথে চলিতে থাকে; তাই আমরা প্রাকৃত ব্যাকরণে এই বহুবিস্তৃত দেশব্যাপী অতীতের ল চিহ্নের মূল পাই না।

অতীতে 'ল' কিরূপে হইল, সে সম্বন্ধে প্রধান দুইটি মত প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও শব্দকোষের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয় বলেন (ব্যাকরণ ১৩৫পৃঃ),—সং গতঃ, বাং গেল, আসাং গল, ওং গলা, মাং গেলা, অর্থাৎ ত স্থানে ল।.........ত লুপ্ত হইয়া হিং গয়া।......সং কৃতঃ—করিত—করিদ—করিড—করিল।" এখানে তিনি দেখাইয়াছেন, 'ত'এর বিকারে ক্রমে দ, ড, ড় হইয়া পরে ল হইয়াছে। প্রাকৃতপ্রকাশ ব্যাকরণের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলেন,* "শৌরসেনী 'দ', মাগধী 'ড' হইতে অতীতের ল চিহ্ন আসিয়াছে।" অর্থাৎ বসন্ত বাবুও সংস্কৃতের ক্ত প্রত্যয়ের বিকারে শৌরসেনী 'দ' এবং মাগধী 'ড' ও তাহা হইতেই অতীতের 'ল' হইয়াছে বলেন।

এখন এই দুই মত অর্থাৎ প্রায়-এক মতের বিচার করা যাউক। শৌরসেনী প্রাকৃতে সংস্কৃতজাত শব্দের অনাদি অযুক্ত 'ত' স্থানে প্রায় 'দ' হইত; কিন্তু 'দ' স্থানে মাগধী 'ড' সকল স্থানে হইত না। মাগধীতে সাধারণতঃ 'ত'এর বিকার 'দ' স্থানে 'ড' হইত না, কেবল কৃ, মৃ ও গম্ ধাতুর পরে ক্ত-প্রত্যয়ের স্থানে দ কিংবা ড হইত। যথা সং মৃ+ক্ত, মাগধী প্রাঃ মদ বা মড়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে বিকৃতির দোহাই দিয়া সাধারণভাবে সংস্কৃতের ক্ত-প্রত্যয় স্থানে ড় ও ক্রমে ল হইয়াছে বলা হইতেছে, তাহার মধ্যে কেবল একটি ধাতুর বিকৃতি বাঙ্গলা ভাষাতেই প্রচলিত আছে, মাগধী বা শৌরসেনীতে নাই। সং মৃত শৌরসেনীর দেশে 'মুর্দা' আর বাঙ্গলায় 'মড়া'।

আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সাধারণ নিয়ম, অতীত কালে ঈঅ বা ইঅ হইত। ইহা সংস্কৃতের ক্ত-প্রত্যয়েরই বিকার। শৌরসেনীর দেশের ভাষায় অর্থাৎ হিন্দীতে এখনও অতীত কালে ক্ত-প্রত্যয়ের বিকৃতি ইঅ হয়। যেখানে বিকৃতির সাধারণ নিয়ম প্রচলিত ছিল, সেখানে একটা প্রদেশের ২।১ টা ধাতুর সম্বন্ধে একটা প্রত্যয়ের বিকৃতি সাধারণ ভাবে চলিবে কেন? উচ্চারণের বিকারেরও একটা নিয়ম আছে, যাহাতে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে

---

* বিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

সহজেই তৃতীয় বর্ণ আসিতে পারে অর্থাৎ 'করিত' স্থানে 'করিদ' হওয়া সহজ। কিন্তু 'দ' স্থানে 'ড' হওয়া তত সহজ নহে। অধিকাংশ শিশুর পক্ষে 'ড' উচ্চারণ অপেক্ষা 'দ' উচ্চারণ সহজ। তাই অনেক শিশু ট-বর্গের স্থানে, এমন কি, চ-বর্গের স্থানেও ত-বর্গ উচ্চারণ করে। সাহেবদের মত যে শিশুর ত-বর্গ স্থানে ট-বর্গ উচ্চারণ হয়, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। তবে যেখানে মূর্দ্ধণ্য বর্ণের প্রাধান্য থাকে, সেখানে ত-বর্গের ট-বর্গে পরিণতি সহজেই হয়। যথা,—সং নৃত ধাতুজাত নৃত্য স্থানে নচ্চ, পরে নাচ; কিন্তু নর্ত্ত স্থানে নট্ট, পরে নাট হইয়াছে। এখানে মূর্দ্ধণ্য বর্ণ র'এর প্রভাব পড়িয়াছে। সেইরূপ 'দণ্ড' শব্দের শেষের দুইটি মূর্দ্ধণ্য বর্ণের প্রভাবে কেহ কেহ 'ডণ্ড' বলে।

প্রাকৃতের প্রথম বিকৃত রূপই মগধে অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত। কৃষ্ণ, দধি, ক্রোড় শব্দ প্রাকৃতে কহ্নু, দহি ও কোর হইতে মগধে এখনও কাহ্নাই, দহি ও কোর; কিন্তু বাঙ্গালায় কানাই, দই ও কোল। সুতরাং মগধে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের এত দুর বিকৃতি ঘটিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হয় না। তদ্ভিন্ন মগধে বর্ত্তমানে দেখিতে পাই, 'ল' স্থানে লোকে 'ড়' ও 'র' উচ্চারণ করে, বিপরীত উচ্চারণ বিরল। 'তাল'কে 'তাড়', 'তল'কে তর সাধারণ লোকেও বলে এবং বিদ্যাপতির লেখাতেও 'ল' স্থানে 'র'এর প্রয়োগ খুব বেশী, যথা— 'সকল' স্থানে 'সগর', 'কাজল' স্থানে 'কাজর', 'উজ্জ্বল' স্থানে 'উজোর' প্রভৃতি। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের 'ত' এত অধিক বিকৃত হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন প্রবিষ্ট, উপবিষ্ট, রক্ত, মত্ত, তপ্ত প্রভৃতি পদে যুক্ত 'ত' স্থানে 'দ' ও ক্রমে 'ল' হইবার কোনই সম্ভাবনা দেখি না। আর এক প্রদেশের এত অধিক বিকৃতি অন্য প্রদেশে সহজে গৃহীত হইবার সম্ভাবনাও অল্প।

আমার মনে হয়, 'কৃত' শব্দের স্থানে 'ল' হইয়াছে। কথাটা কিছু অদ্ভুত ঠেকিল, সন্দেহ নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামক পুস্তকের একটি গানে আছে (৫৪ পৃঃ) "মই অহারিল গঅণত পণিআ"। ইহার সংস্কৃত টীকায় আছে—মই = ময়া এবং অহারিল = অহারীকৃতম্ এবং অন্যত্র 'মেলিলি' শব্দের টীকায় আছে 'মুক্তীকৃত্য'।

শুধু প্রাকৃত জনই যে সংস্কৃতের ক্রিয়ার বিবিধ রূপকে কঠিন মনে করিত, এমন নহে; যাঁহারা সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিতেন, তাঁহারাও অতীত কালে বিবিধ গণের ধাতুর রূপের স্থলে কৃদন্ত ক্ত বা ক্তবতু প্রত্যয় করিয়া কাজ সারিতেন, কখনও বা বর্ত্তমানে স্ম যোগ করিতেন। লিটে আর এক প্রকার কৌশল ছিল, কতকগুলি ধাতুতে আম্ প্রত্যয় করিয়া অস, ভূ বা কৃ ধাতুর লিটের রূপ যোগ করিয়া দিলে চলিত। * যথা,—জাগরাঞ্চকার, গোপায়াঞ্চকার। আবার লিটের পুরুষ ও বচনভেদে ৯টি বিভিন্ন রূপ এড়াইবার জন্য 'কৃত' যোগ করিবার

* ইহারই অনুকরণে বাঙ্গলায় সং ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে হওয়া বা করা ধাতুযোগে বহু ক্রিয়ার জন্ম হইয়াছে। এরূপ ক্রিয়া শুধু অতীত বলিয়া নহে, সর্ব্বকালেই ব্যবহৃত হয়।

কৌশল উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। 'কৃত' যোগে অভূত-তদ্ভাবে 'চ্বি' বিকল্পে হইত; যথা,—দ্রব-কৃত বা দ্রবীকৃত। এই 'কৃত'যুক্ত ক্রিয়াপদে সেইরূপ বিকল্পে ই আগম হইয়া দুইটি পদ হইত; যথা—পঠ ধাতু হইতে পঢ়ল বা পঢ়িল। মগধে ও যুক্তপ্রদেশে এখনও অনন্তরার্থে ধাতুর উত্তর স্থানে স্থানে কৃ ধাতুজাত কর্ বা কে প্রযুক্ত হয়; যথা—জায়-কর্ বা জায়-কে। এখানেও অতীতের ছায়া আছে।

কোন শব্দ যখন প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার এত দ্রুত ও এত অধিক পরিবর্ত্তন হয় যে, তাহার শেষ চিহ্ন দেখিয়া মূল রূপ বাহির করা কঠিন হইয়া উঠে। ইংরাজীতে বিশেষ্যে যে ly যোগ করিয়া বিশেষণ হয়, তাহার আদিরূপ like. সংস্কৃতে পুরুষ ও বচন-ভেদে প্রতি ল-কারে যে ৯টি বিভক্তি হয়, তাহাও আদিতে সর্ব্বনাম যোগে হইয়াছিল। যোগেশ বাবু বাঙ্গালা ব্যাকরণে দেখাইয়াছেন যে, তেলুগু ভাষায় এখনও ক্রিয়ার রূপে সর্ব্বনামের রূপ বিভক্তিরূপে সুস্পষ্ট বর্ত্তমান। কিন্তু সংস্কৃতের ক্রিয়ার রূপে তাহা এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইরূপ 'কৃত' শব্দটি যখন অতীত কালসূচক প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, তখন বড় শীঘ্র শীঘ্র তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল। প্রাকৃত জনের হাতে পড়িয়া অল্পপ্রাণ, অযুক্ত ক ও ত সহজেই লুপ্ত হইল এবং 'ঋর' বিকার 'র' 'ল'য়ে পরিণত হইল। অর্থাৎ অহার+কৃত প্রথমে প্রাকৃতে হইল 'অহারির', পরে দাঁড়াইল 'অহারিল'।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যুক্ত 'ত' স্থানে 'দ' হওয়া সম্ভব নহে। ক্ত-প্রত্যয় হইলে সর্ব্বত্র 'ই' আগমও হইত না। যথা—তিক্ত, তিত্ত, তিতা, রক্ত, রত্ত, রাতা, মত্ত, মাতা। বাঙ্গালা দেশে আবার ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণগুলিতে হিন্দীর ন্যায় 'ত'র লোপ ঘটে, যথা—ক্ষিপ্ত, ক্ষেপা, ধৌত, ধোয়া, কৃত কর্ম্ম, করা কাজ। সুতরাং ক্ত-প্রত্যয়ের ত স্থানে অন্ততঃ বাঙ্গলা দেশে ল হয় নাই। ধৌত অর্থে ধোঅল এবং উপবিষ্ট অর্থে বৈঠল এখনও বিহারে প্রচলিত। 'বৌদ্ধ দোহা ও গান'কে আমার সেই বিহার বা মগধের গান বলিয়াই অনুমান হয়। * সেই "বৌদ্ধ দোহা ও গানে" নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাই,—

শব্দ	টীকার অর্থ	শব্দ	টীকার অর্থ
সুতেলা	সুপ্ত	মাতেল	প্রমত্ত
মিলিঅ	মিলিত	মাতেলা	
মিলিআ		পইঠে	প্রবিষ্ট
মিলিল	মিলিত	পইঠেল	—
মাতা	মত্ত		

একবার ক্ত-প্রত্যয়জাত ষ্ট, ত্ত, প্ত স্থানে যথাক্রমে ঠ, ত, ত হইয়াছে, আবার ক্ত-প্রত্যয় হইয়া 'ত' স্থানে 'ল' হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। ক্ত-প্রত্যয়ের অযুক্ত ত যে লুপ্ত হইত, তাহা মিলিঅ ও মিলিআ পদে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে।

---

* ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "পরিচারিকা" দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গলার লান্ত পদগুলি ক্ত প্রত্যয়-জাতই হউক, আর কৃতপ্রত্যয়-সাধিতই হউক, এগুলির কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ হইত এবং বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত। যথা,—

মই বুঝিল=ময়া অবগতম্ (বৌদ্ধ দোহা ও গান, ৫৪ পৃঃ)

পাকিল দাড়ি মাথার কেশ=পক্ক (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ২ পৃঃ)

এই লান্ত পদগুলি বিশেষণ বলিয়াই স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে ঈকারান্ত হইত। যথা,—আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী—(টীকা বঙ্গালিকা ভূতা) ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী—(বৌদ্ধ দোহা ও গান, ৭৩ পৃঃ)। বড়াই চলিলী আন পথে—(শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ৯ পৃঃ), চান্দে পরীহলি মোতী—(বিদ্যাপতি)।

২। ভবিষ্যতে 'ব'

মাগধী বা মগহি, ভোজপুরী, আওধী, মৈথিলী, বাঙ্গলা, ওড়িয়া ও আসামী, এই কয়টি ভাষায় ভবিষ্যৎকালসূচক 'ব' চিহ্ন প্রচলিত আছে। ইহা সংস্কৃতের 'তব্য' প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে। * সং 'তব্য' হইতে প্রাকৃত 'অব্ব', পরে 'অব' হইয়াছে। তব্য প্রত্যয়ান্ত পদ কৃদন্ত বিশেষণ; সুতরাং পুরুষভেদে ইহার পরিবর্ত্তন হইত না, কর্ম্মের বচন-ভেদে হইত। কারণ, তব্য প্রত্যয়-সাধিত পদ কর্ম্মবাচ্যের; সুতরাং কর্ত্তায় ৩য়া হইত। যথা,—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	প্রাচীন মৈথিল †	প্রাচীন বাঙ্গলা।
ময়া যাতব্য (ং)	মএ যাঅব্ব	মোয় জায়ব	মো জাইব বা মোএঁ জাইবোঁ
অস্মাভিঃ যাতব্য (ং)	অহ্মেহি যাঅব্ব	হমে জায়ব	আহ্মে জাইব
ত্বয়া যাতব্য (ং)	তুএ বা তএ যাঅব্ব	তুঅ জায়ব	——
যুষ্মাভিঃ যাতব্য (ং)	তুহ্মেহি যাঅব্ব	——	তোহ্মে জাইবেঁ
লোকেন যাতব্য (ং)	লোকেণ যাঅব্ব	লোকে জায়ব	লোকে জাইব

এখন আমরা বাঙ্গলায় প্রথম পুরুষে ভবিষ্যতের রূপের চিহ্ন 'বে' প্রয়োগ করি। যথা,—লোকে যাইবে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে এখনও 'যাইব' হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের যুগের পরেও পশ্চিম-বঙ্গে সেইরূপ 'যাইব' প্রচলিত ছিল। প্রথম ও উত্তম পুরুষে 'যাইব' হইত, কিন্তু মধ্যম পুরুষে সম্ভ্রমসূচক বহুবচনান্ত করিতে গিয়াই বোধ হয় 'তোহ্মে জাইবেঁ' এইরূপ একারান্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধ গান ও দোহায় যতগুলি বান্ত পদের উদাহরণ আছে, সমস্তই কর্ম্মবাচ্যের বিশেষণ; যথা,—

বাক্য	টীকার অর্থ
করিব নিবাস	অস্মাভির্নিবাসঃ করণীয়ঃ।

---

* শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরও এই মত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† নেপালে বাঙ্গালা নাটক ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে গৃহীত। প্রথমখানির ৩ অংশ মৈথিল ভাষা।

বাক্য	টীকার অর্থ
করিবে ম সঙ্গ	ময়া অভিষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ
খাইব মই	ময়া ভক্ষণং কর্ত্তব্যং। ইত্যাদি

তব্য প্রত্যয় হইলে ধাতুর উত্তর 'ই' আগম হইত। অর্থাৎ কতকগুলি ধাতুতে 'ই' হইত, কতকগুলিতে হইত না। বাঙ্গলা ভাষায় লান্ত পদের ন্যায় সর্ব্বত্র 'ই' আগম হয়, কিন্তু বর্ত্তমান বা প্রাচীন কোন মৈথিল ভাষাতেই 'ই' আগম হয় না।

বাঙ্গলার বাচ্য

বাঙ্গলা ভাষার ক্রিয়ার তিন কালের মধ্যে ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া আদিতে কর্ম্মবাচ্যের বা ভাববাচ্যের ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে আমি বাচ্য সম্বন্ধে একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই। ইংরাজী ও হিন্দীতে (বর্ত্তমান) অকর্ম্মক ক্রিয়ার বাচ্যান্তর হয় না। সংস্কৃতে কর্ত্তৃবাচ্যের সকর্ম্মক ক্রিয়ার বাচ্যান্তরে কর্ম্মবাচ্য এবং অকর্ম্মক ক্রিয়ার বাচ্যান্তরে ভাববাচ্য হয়। অথচ বাঙ্গলায় অকর্ম্মক-সকর্ম্মক নির্বিশেষে একরূপেই বাচ্যান্তর হয়—'হ' বা 'যা' ধাতু যোগ করিয়া। যথা,—

কর্ত্তৃবাচ্য	বাচ্যান্তর
আমি শুইলাম	আমার শোওয়া হইল
আমি ভাত খাইব	ভাত খাওয়া যাইবে

সুতরাং বাচ্যান্তরে কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য, এই দুইটি পৃথক্ নাম না রাখিয়া, আমি দুইটিকে "হওয়া-বাচ্য" বলিব * কারণ, এরূপ বাচ্যে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব লুপ্ত; কাজটাই হয়, তা সেটা অকর্ম্মক ক্রিয়াই হউক, আর সকর্ম্মক ক্রিয়াই হউক। যথা,—শোওয়া হইল বা গেল, চুরি হইল বা গেল। এখানে কে শুইল বা কে চুরি করিল, তাহা জানিবার জন্য কাহারও আগ্রহ নাই। যেখানে কর্ত্তা একেবারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেরূপ ক্রিয়াবাচ্যকে সংস্কৃতে কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য বলে। আমি সেগুলিকেও হওয়া-বাচ্য বলিতে যাই। যথা,—হাসি পায়, ক্ষুধা লাগে, মাথা ধরিয়াছে, পয়সা জুটিল না ইত্যাদি। ইহাদের কর্ত্তৃবাচ্য হয় না। আর যেখানে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব স্পষ্ট, কাজটা কেহ করিতেছে, তাহার নাম দিব "করা-বাচ্য"। যথা—আমি শুই, সে পুথি পড়ে।

উত্তর-ভারতের সমস্ত দেশভাষার (শুধু বাঙ্গলা নহে) মূলে এই হওয়া-বাচ্য ছিল। হিন্দী ও মারাঠীতে যাহাকে এখন সকলে ক্রিয়া মনে করে, তাহাও মূলে কোন কোন স্থানে কর্ম্মবাচ্যের কৃদন্ত বিশেষণ ছিল; সেই জন্য স্ত্রীলিঙ্গে পুংলিঙ্গভেদ হয়। মারাঠী ভাষায় ঠিক সেই কারণে ক্রিয়ার ৩ লিঙ্গ হয়। বিদ্যাপতির পদাবলী বা চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অতীত কালসূচক লান্ত পদগুলি স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কারান্ত হইত ঠিক এই কারণে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বাঙ্গলায়

---

* ইংরাজীতে Passive Voice বা কর্ম্মবাচ্য "to be' (অর্থাৎ হওয়া) ক্রিয়াযোগে সম্পন্ন হয়।

যেন অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াগুলি মূলে হওয়া-বাচ্য, কিন্তু কর্ত্তায় ৩য়া বিভক্তি কই? সর্ব্বনামের এখন যাহাকে আমরা প্রথমা বিভক্তি মনে করি, মূলে তাহা তৃতীয়া বিভক্তি ছিল। পূর্ব্বের দুই এক দৃষ্টান্ত দেখা যাউক,—

প্রাচীন	মাগধী	মই অহারিল
প্রাচীন	মৈথিলী	তুঅ জায়ব
প্রাচীন	বাঙ্গলা	লোকে জাইব

এখানে "মই" অস্মৎ শব্দের একবচনে, 'তুঅ' যুষ্মৎ শব্দের একবচনে এবং 'লোকে' লোক শব্দের একবচনে ৩য়া বিভক্তি। সংস্কৃতে অস্মৎ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'ময়া' হয়, কিন্তু প্রাকৃতে মে, মএ, মই, মমাই, দেশ ও কালভেদে এই চারি পদ হইত। ইহা হইতে বাঙ্গালার 'মুই' এবং হিন্দীর 'মৈঁ' হইয়াছিল। 'মুই' বোধ হয়, এখনও উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অশিক্ষিত লোকের ভাষায় প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঙ্গালার ক্রিয়ার বাচ্যান্তর করিতে হইলে 'হ' বা 'যা' ধাতু যোগ করিতে হয়। এই 'যা' ধাতু আসিল কোথা হইতে? 'আমি পড়ি' এই অনুজ্ঞা বা বিধির বাচ্যান্তর হইবে 'পড়া যাউক'। এখানে 'যা' ধাতুর মূল অর্থ 'পাদচালনা' করিলে সঙ্গত হয় না। প্রাকৃতপ্রকাশ ব্যাকরণে একটি সূত্র আছে (৭.৮),—"ভাব ও কর্ম্মবাচ্যে বিহিত যক্' স্থানে ইঅ ও ইজ্জ এই দুইটি আদেশ হয়।" যথা—সং পঠ্যতে, প্রাঃ পঢ়ীঅই, পঢ়ীজ্জই। বাং পড়া যায়। আমার অনুমান হয়, প্রাং পঢ়ী-অই হইতে বাং পড়া হয় এবং পঢ়ীজ্জই হইতে বাং পড়া যায় আসিয়াছে। বৌদ্ধ গান ও দোহা হইতে আমার অনুমানের সমর্থক দুই একটি প্রয়োগ তুলিতেছি।

শব্দ	টীকার অর্থ
বকৃথানিজ্জই	ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে
কহিজ্জই	কথ্যতে
কিজ্জই } করিজ্জই }	ক্রিয়তে

শ্রীরাখালরাজ রায়

শব্দার্থ-বিজ্ঞানের ইতিহাস

এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ ভাষার বাইরের দিক্‌টা লইয়াই প্রধানতঃ ব্যস্ত আছেন। কোন্ ভাষার ধ্বনি পরিবর্ত্তনের নিয়ম কিরূপ, শব্দের বিন্যাস এবং স্বরনির্দ্দেশ কিরূপ হইবে—কেবল এই সকল বিষয়ই তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু যে জিনিসটা বস্তুতঃ ভাষার প্রাণ, শব্দের সেই অর্থের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে নাই বলিলেই চলে। বিষয়টা অপ্রয়োজনীয়, এমন নয়; ইহা বড় বড় মাথার খোরাক যোগাইবার অনুপযুক্ত, তাহাও নয়; কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক, ইহা পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই এবং বোধ হয়, তাহার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে।

মাত্র ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত মিশেল ব্রেআল (Michel Breal) যথারীতি অবতারণা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। Essai de Semantique নামক পুস্তকে তাঁহার গবেষণার ফলসমূহ লিপিবদ্ধ হয়। এই পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ হেনরি কাষ্ট (Mrs. H. Cust) কর্ত্তৃক ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতপ্রবর ব্রেআল প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার গবেষণার ফলস্বরূপ কয়েকটি প্রবন্ধ ফরাসী দেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বিষয়টি কিরূপ কঠিন এবং গুরুতর, তাহা অধ্যাপক ব্রেআলের কথা হইতেই বুঝা যাইবে। তিনি বলিতেছেন,—"বার বার বিষয়ের কঠিনত্বের দ্বারা প্রতিহত হইয়া আমি এ দিকে আর হাত দিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। যত বার কাজটি আরম্ভ করিব মনে করিয়াছিলাম—তত বারই আমাকে এই মতলব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।" ব্রেআল যে সমস্ত তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলি প্রধানতঃ মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত; কাজেই তিনি যে সা ভাষার আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলির পক্ষে এই সব নিয়ম যেমন খাটে, অন্যান্য ভাষার পক্ষেও তদ্রূপ। তিনি ভূমিকায় বলিতেছেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য কেবল একটা আপাততঃ চলনসই-গোছের প্ল্যান খাড়া করা। কারণ, এ বিষয়ে এখন অনুসন্ধান কিছুই হয় নাই এবং যথারীতি অনুসন্ধান করিতে গেলে দুই চারি পুরুষ ধরিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণকে পরিশ্রম করিতে হইবে—নতুবা বিশেষ কিছু হইবে না।

শব্দকোষ সঙ্কলন-বিস্তাতেই শব্দার্থ-বিজ্ঞানের সূত্রপাত। ১৮২৬—২৭ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত এবং ১৮৩৯ অব্দে প্রকাশিত ল্যাটিন ভাষা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা রাইসিগ (K. Reisig) দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শব্দের অর্থপরিবর্ত্তনের ধারা কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আলোচনা করা যায়, তাহার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু অকাল-

মৃত্যু হেতু রাইসিগ আর এ বিষয়ে বেশী কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারই ছাত্র আগাথন বেনারি (Agathon Benary, ১৮৩৪) শব্দার্থতত্ত্বকে কোষসঙ্কলন-বিস্তার গণ্ডী হইতে বাহিরে আনিয়া, ইহাকে এক বৃহত্তর এবং গম্ভীরতর অর্থ প্রদান করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম শব্দের আকৃতিগত এবং অর্থগত দিকের প্রভেদ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেন। শুধু শব্দ নয়, এমন কি, প্রত্যয়াদির অর্থের দিক্ হইতে আলোচনার সূত্রপাত তিনিই প্রথম করেন।

অধ্যাপক ব্রেআল যে সময় এ-বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, অন্যান্য কয়েক জন পণ্ডিতও সে সময়ে এ দিকে কিছু কিছু কাজ করিতেছিলেন। ব্রেআলের পরেই সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-পণ্ডিত পাউল (Paul)এর নাম করিতে হয়। ভাষার ইতিহাসের তথ্যবিষয়ক তাঁহার Prinzipien der Sprachgeschichte নামক পুস্তক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ভাষাতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনিয়া দেয়। এই পুস্তকের কয়েক অধ্যায়ে অধ্যাপক পাউল শব্দার্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অতি সুচিন্তিত কয়েকটি তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক ষ্ট্রঙ্, লোজম্যান এবং হুইলার (Strong, Logeman এবং Wheeler) একত্রে পাউলের এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক পোষ্টগেট (Postgate) ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ট্রিনিটি কলেজের ফেলোর পদ গ্রহণ মানসে শব্দার্থতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় উদ্যোগী হন—কিন্তু উপযুক্ত উপাদানের অভাবে শীঘ্রই তাঁহাকে বিরত হইতে হয়। পরে তিনি এই বিষয় লইয়া আবার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৬ অব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করেন।

বর্ত্তমান কালের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের অগ্রণী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ব্রুগমান (Brugmann) এবং আর দুই জন জার্ম্মাণ পণ্ডিত—বেশ্‌টেল ও হিয়ারডেগেন (Bechtel and Heerdegen) ও ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিৎ সুইট (Sweet) প্রভৃতি সুধীগণ, শব্দার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতে এই বিজ্ঞানের নাম পর্য্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকেই শুনেন নাই। অবশ্য যে হিন্দু জাতির অপূর্ব্ব ব্যাকরণ আজিও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, তাঁহারা যে একেবারে এই বিষয়টি ভাবেন নাই, তাহা নয়। যাস্ক (খৃঃ পূঃ ৫০০) তাঁহার নিরুক্তের মধ্যে যখন নিম্নলিখিত ভাবে তর্ক করিতেছেন, তখন আমরা শব্দার্থতত্ত্বের মূল কথা সম্বন্ধে কিছু আভাস পাই। তিনি বলিতেছেন,—"ঘাসকে তৃণ বলা হয়; কেন না, ইহাতে খোঁচা লাগে, সেই জন্য খোঁচা অর্থসূচক তৃ ধাতু হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে যে জিনিসেই খোঁচা লাগে, তাহাকেই তৃণ নাম দেওয়া হয় না কেন—যেমন একটা ছুঁচ কিংবা বর্শা? আবার একটা স্তম্ভকে স্থূণা বলা হয়; কেন না, ইহা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সেই জন্যই কথাটি স্থিরতাসূচক স্থা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাহা হইলে যা কিছু কোন জিনিষকে স্থির করিয়া রাখে, তাহাকে স্থূণা বলা হয় না কেন?"

মহর্ষি পাণিনিও (খৃঃ পূঃ ৩৫০) যে শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ে কিছু ভাবেন নাই, এমন নয়। প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৫৬ সূত্রের নীচে তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, "ব্যাকরণে অর্থতত্ত্ব বিষয়ে কিছু আলোচনা না করিয়া শুধু শব্দ বিশ্লেষণ করা উচিত। কারণ, অর্থ ব্যাকরণের দ্বারা নিরূপিত হয় না, দেশে যেরূপ চলিত আছে, অর্থ সেইরূপই হয়। যেমন একজন অজ্ঞ মূর্খ, যে জীবনে ব্যাকরণ কি, দেখে নাই বা শুনেও নাই—তাহাকে রাজপুরুষের কথা বলিলে সরকারী কর্ম্মচারীকেই বুঝিবে—রাজাকে নয়।"

মীমাংসা এবং ন্যায়দর্শনের মধ্যে এবং বৈদিক সাহিত্য ও ব্যাকরণের টীকায় মাঝে মাঝে শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনা দেখা যায়। সংস্কৃত অলঙ্কার পুস্তকসমূহেও শব্দের অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

কিন্তু এই সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্লেখ ব্যতীত শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ে কোন নিয়মিত আলোচনা আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। পুণার অধ্যাপক গুণে (Dr. P. D. Gune) তাঁহার নবপ্রকাশিত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পুস্তকে (Introduction to Comparative Philology) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ তারাপুরওয়ালা (Dr. I. J. S. Taraporewala) তাঁহার লেক্‌চার-নোটে শব্দার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ আলোচনা করিতে গিয়া সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষাসমূহ হইতে কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছেন।

বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে এই ধরণের কাজ এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। শব্দার্থবিজ্ঞান যে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সেই ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপনাই মাত্র সে দিন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ ডিগ্রির জন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাঙ্গলা দেশেও ভাষাবিজ্ঞানের ধ্বনিতত্ত্বের দিক্‌টাই (Phonetics) সুধীগণের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি সুযোগ্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থবিজ্ঞানের চর্চ্চা এখন আরম্ভই হয় নাই।

আশা করা যায়, এখন হইতে কাজ দ্রুত অগ্রসর হইবে। সরঞ্জাম এবং মাল-মসলার অভাব নাই—যাহা কিছু অভাব লোকের। স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, স্বর্গীয় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অন্যান্য কয়েক জনের ভাষাসংক্রান্ত পুস্তক এবং প্রবন্ধাদি হইতে অনেক মালমসলা যোগাড় হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশেও এ দিকে হাত দেয়, এমন লোক কই? শব্দার্থবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র অসীম বলিলেই হয়; কিন্তু বোধ হয়, সমগ্র জগতে ২০ জনের বেশী পণ্ডিত এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই।

অধ্যাপক পোষ্টগেট বলিতেছেন,—"আমাদের এই বিজ্ঞানের এখন নিতান্ত শিশু অবস্থা। ইহার প্রধান অভাব এখন উপাদান সংগ্রহ করা। এই বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকে তাহার মাতৃভাষা লইয়াই আরম্ভ করিতে হইবে। ইহার অবস্থা এখন এমন হয় নাই যে, নিতান্ত নগণ্য সেবকের যৎসামান্ত কার্য্যও অবহেলা করিতে পারে। এই জন্যই আমার মত ব্যক্তির এই ক্ষুদ্র চেষ্টা।"

এই বিজ্ঞানের প্রথম অভাব একটি উপযুক্ত পরিভাষার সঙ্কলন। গ্রীসের ইতিহাস-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ গ্রোট সাহেবের ভ্রাতা অধ্যাপক গ্রোট (Prof. Grote) একটি পরিভাষা তৈয়ার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। Journal of Philology নামক ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকার প্রথম কয়েক সংখ্যায় তাঁহার মৃত্যুর পর কতকগুলি প্রবন্ধে এই পরিভাষা প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁহার নামকরণ-প্রণালী তত সুবিধাজনক না হওয়ায় সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই।

এমন কি, এই বিজ্ঞানের নামটি পর্য্যন্ত বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন ভাবে প্রস্তাব করেন। গ্রীক-ভাষায় Rhema বলিয়া একটি শব্দ আছে, তাহার মানে "যাহা কথিত হইয়াছে" (a thing said)—তাহা হইতে অধ্যাপক পোষ্টগেট প্রস্তাব করেন Rhematology নাম। অধ্যাপক ব্রেআল গ্রীক Semaino (to signify) হইতে নাম করিয়াছেন Semantics। Phonetics যেমন ধ্বনিতত্ত্ব—Semantics সেইরূপ অর্থতত্ত্ব। কিন্তু বাঙ্গলায় অর্থশাস্ত্রের (Political Economy) সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই 'অর্থ' শব্দটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় আমরা এই বিজ্ঞানের বাঙ্গলা নাম দিতে চাই—**শব্দার্থতত্ত্ব**। অবশ্য শব্দ কথাটি এখানে অনেকটা গ্রীক Rhema (a thing said) এই অর্থেই আমরা ধরিব। এই বিজ্ঞানে শব্দ, শব্দসমষ্টি এবং বাক্যের অর্থ আলোচিত হওয়া উচিত। বারান্তরে এ বিষয়ে অন্যান্য আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পরিগৃহীত লেখকের এম এ, Thesis হইতে সঙ্কলিত।
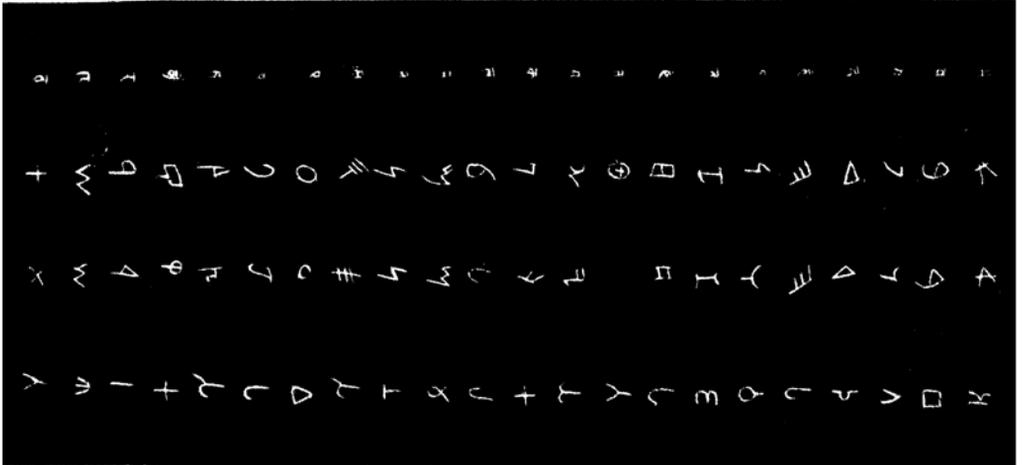
১। ফিনিসীয়, আমোনাইট ও ব্রাহ্মী।
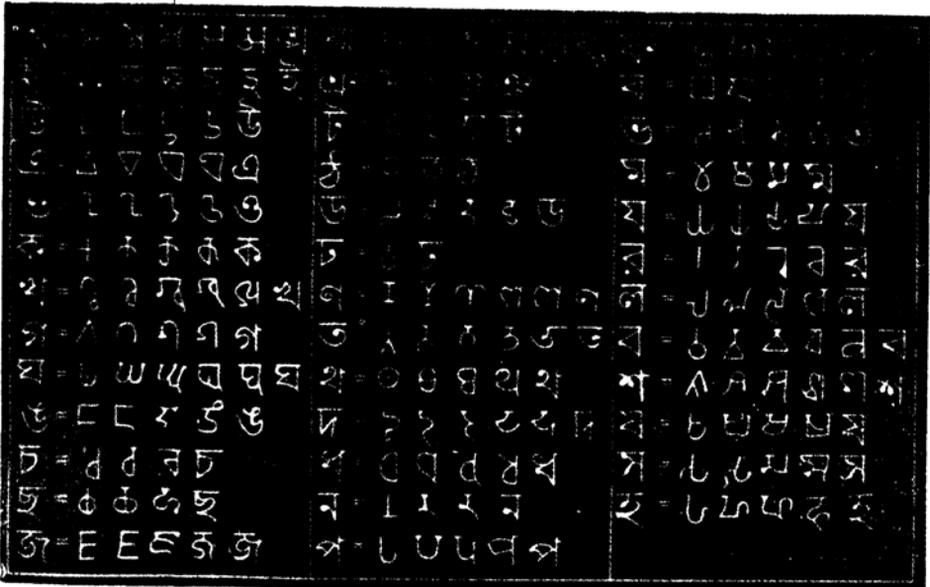
২। ব্রাহ্মী হইতে বাঙ্গালা।

কোহিনুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা।

৩। হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বে যশোরে লেখা বৌদ্ধ পুথি।

৪। হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বে যশোরে লেখা বৌদ্ধ পুথির স্বরবর্ণ।

৫। হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বে যশোরে লেখা বৌদ্ধ পুথির ব্যঞ্জন বর্ণ।

৭। ব্রজাবলী।

৮। কালচক্রাবতার।

৯। চর্য্যাগীতি।

কোহিনুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা

১০। কুটিনীমতম্। ইং ১১৭২।

১১। হেবজ্রতন্ত্রটীকা। ১১৯৮ ইং।

১২। রামচরিত মূল।

১৩। রামচরিত টীকা।

১৪। দোহাকোষপঞ্জি

১৬। অপোহসিদ্ধি।

১৭। সুভাষিতসংগ্রহ।

১৪। দোহাকোষপঞ্জি

১৬। অপোহসিদ্ধি।

১৭। সুভাষিতসংগ্রহ।

১৮। পঞ্চরক্ষা।

১৯। জীমূতবাহনের ধর্ম্মরত্ন।

২০। কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ। প্রথম অংশ।

২১। কৃষ্ণকীর্ত্তন।

২২। বোধিচর্য্যাবতার। ইং ১৪৩৬।

২৩। কাশীদাসের আদিপর্ব্ব। বাং ৯৮৫।

২৪। অঙ্গদরায়বার। বাং ১০৮০।

২৫। জৈমিনি ভারত। বাং ১১৭৫।

২৬। হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের শিলাপত্র।

২৭। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তি।

২৮। বল্লালসেনের সীতাহাটী প্রশস্তি

২৯। বল্লভদেবের শিলাপত্র। ইং ১১৮৫।

৩০। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাম্রপত্র।

৩১। বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন।

৩২। চট্টগ্রাম তাম্রশাসন। ইং ১২৪৩।